International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 186-198
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.211

ত্রাণ ও পুনর্বাসনঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা, ১৯৪৭-৭১

মোঃ নাসির আহমেদ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the aftermath of Independence, the influx of refugees into West Bengal created a protracted and complex crisis of relief and rehabilitation for both the state and central governments. A vast population arriving from East Bengal required shelter, land, and employment, yet the absence of reliable statistics prevented the formulation of sustainable solutions. Although the central government allocated funds, planning and implementation rested with the state, restricted by rigid budgetary categories. Continuous refugee arrivals, uncertain demographic data, and resistance to resettlement outside West Bengal under the Dandakaranya project further complicated the situation. The government's inadequate grasp of ground realities led to repeated establishment and withdrawal of relief camps, acute land shortages, and rising population density, rendering agricultural rehabilitation nearly impossible. Moreover, policy indecision and short-sightedness at both state and central levels obstructed durable resolutions. Consequently, refugee relief and rehabilitation in West Bengal emerged not merely as an administrative challenge but as a multidimensional crisis of economic, social, and demographic balance in modern Indian history.

Keywords: Partition, Refugee, Relief, Rehabilitation, Camps, Dandakaranya.

ভূমিকা:

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়টি ছিল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির কাছে সবচেয়ে জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটগুলির মধ্যে একটি। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা ছিল বিপুল সংখ্যক, কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের জন্য কর্মসংস্থান, জমি, আশ্রয়, নিরাপত্তা ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারকে এক বড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। পাঞ্জাবে স্বাগত উদ্বাস্তুদের জন্য 'Evacuee Property' বা 'শত্রু সম্পত্তি'-কে যেভাবে সরকারি উদ্যোগে কাজে লাগানো হয়েছিল বাংলা ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের জনস্রোত পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়লে দিন দিন অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সমস্যা এক অসম্ভব পর্যায়ে চলে যেতে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্র সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করে বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব দিলেও অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশিকা দিয়ে দেয়া হয়, যা তার বাইরে অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি ছিল না। আবার রাজ্যে জমি, কর্মসংস্থান ও আশ্রয় প্রদানের অভাব পূরণ করার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত উদ্বাস্তুদের রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু

উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পকে গ্রহণ না করে নিজেদের মতন পুনর্বাসন খুঁজতে থাকে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বাস্তুদের আগমন, অনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান, রাজ্যের বাইরে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে পুনর্বাসনের অনীহা, বারবার ত্রাণ-শিবির স্থাপন ও প্রত্যাহার করা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের নীতিগত দ্বিধার ফলে সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। অতএব পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রাণ ও পুনর্বাসন উভয় সরকারের কাছে কেবল একটি চ্যালেঞ্জ ছিল না, এটি আর্থ-সামাজিক, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিবর্তন ও ভারসাম্যের বহুমাত্রিক সংকট তৈরি করেছিল। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে যে, উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে রাজ্য-কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও তার বাস্তবায়ন এবং নিজেদের উদ্যোগে টিকে থাকা অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অভিজ্ঞতা।[১]

ত্রাণ ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণি, এরা ছিল অবস্থাপন্ন ও উদ্যোগী, নিজেদের সম্পদ ও বুদ্ধির জোরে নিজেদের পুনর্বাসন নিজেরাই করে নিয়েছিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন ভূম্যাধিকারী এবং উচ্চবিত্ত, যাদের বেশিরভাগেরই কলকাতায় বাড়ি ঘর ছিল। এরা সরকারের ওপর কোন দিক দিয়েই নির্ভর করে থাকেন নি। দ্বিতীয় শ্রেণি, এরা অবস্থাপন্ন না হলেও উৎসাহী। এরা মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় পরিত্যক্ত অথবা জনশূন্য বাড়ি ও ফাঁকা জমিতে জবরদখল কলোনি সৃষ্টির কারিগর। এরা নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরা করতে পেরেছিলেন কিন্তু সম্পদের অভাবে আশ্রয় ও অন্যান্য ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণি, এরা ছিলেন দরিদ্র ও নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর মতো শিক্ষা বা সামর্থ্য কোনটাই এদের ছিল না। এরা মূলত ছিলেন কৃষিজীবী, কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর অথবা ছোট ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে অনেকেই নমশূদ্র। এরা নিজেদের কর্মসংস্থান ও থাকা খাওয়া ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই একান্তভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করত। এরাই সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেয়।[২] এদের পুনর্বাসনই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দণ্ডকারণ্যে ও ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা:

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত পরিকল্পনা, প্রকল্প ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার পূর্বে পর্যায়ভিত্তিক উদ্বাস্তু আগমন বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সরকারি নীতি গৃহীত হতে দেখা গেছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত সময়কালে, বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ভিত্তিতে আগত উদ্বাস্তুদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ের আসা অভিবাসীদের সংখ্যা নিচের সারণিতে দেখানো হল-

---

[১] Saroj Chakrabarty, *With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers: A Record up to 1962,* (Calcutta: Benson's, 1974), p.107; Kranti B. Prakashi, *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal*, (Calcutta: Editions India, 1971), p. 21; রনজিৎ রায়, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন,* (কলকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, ১৯৭৭) পৃ. ৯১; দেবযানী ঘোষ ও সায়ক মুখার্জি (সম্পাঃ), *দেশভাগঃ অকথিত ইতিহাস,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২৩) পৃ.৭৩; *পল্লী বান্ধব প্রত্রিকা,* ১৩-ই আগস্ট ১৯৪৮; *আজাদ প্রত্রিকা,* ৩১-ই আগস্ট ১৯৪৯; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal, p. 1; *Estimate Committee Reports* (1959-60), 2nd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, New Delhi, p. 3; Home Political CR, B Dec. 1950, 602-622, West Bengal State Archive, Kolkata; Home Political CR, B May 1950, 249-272, West Bengal State Archive, Kolkata.

[২] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭২।

সারণি:- ১ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আসা অভিবাসী

অভিবাসী	সময়কাল	পশ্চিমবঙ্গে আগত অভিবাসীদের জনসংখ্যা (লাখে)	পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া অভিবাসী (লাখে)
পুরনো	১৯৪৬-৩১.০৩.১৯৫৮	৩১.৪৭	৩১.৩২
মধ্যবর্তী	০১.০৪.১৯৫৮-ডিসেম্বর, ১৯৬৩	০.৫৫	অজ্ঞাত
নতুন	০১.০১.১৯৬৪-২৫.০৩.১৯৭১	৭.৫৭	৬

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-iii, p.vi.)

উপরে উল্লেখিত উদ্বাস্তুদের এই সময় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের আলোচনায় মিলিত সিদ্ধান্তে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কেবলমাত্র সেই সমস্ত নতুন অভিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করা হবে, যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ক্যাম্প গুলিতে যেতে রাজি হবেন। যার ফলে, পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া এই ৬ লক্ষ উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে কোনো ত্রান বা পুনর্বাসন সুবিধা প্রযোজ্য ছিল না।[৩] এদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম পর্যায়ে আসা অভিবাসী অর্থাৎ পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য।

পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা: নিরবচ্ছিন্ন, পর্যায়ক্রমিক তরঙ্গের আকারে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন কালপর্বে পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থায় কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম পর্যায়ের পুরনো অভিবাসীদের (১৯৪৬-১৯৪৯) জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: দেশভাগের ঠিক পরেই যে সমস্ত শরণার্থী পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের কেবলমাত্র ত্রাণের আওতায় আনা হয়েছিল। দুই দেশের সংখ্যালঘুদের আগমন ও নির্গমন, শরণার্থী সংখ্যা ও এই দেশে তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় তাদেরকে প্রথমে পুনর্বাসনের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। হতদরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু ত্রাণশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল; খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসা এই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলি তাদের প্রদান করা।[৪] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে, কেন্দ্র সরকারের অর্থ সাহায্যে ১৯৪৯ পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৫৫টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। এই ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নগদ অর্থ ও জীবনধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই দুই ধরনের ত্রাণ সরবরাহ করা হত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ছিল খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ, শীতের কম্বল ও পোশাক।[৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্য প্রস্তুত করা মিলিটারি ব্যারাক ও ছাউনিগুলিকে উদ্বাস্তু শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা

[৩] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, *Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal,* Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Govt. of India, March 1976, p. 8.

[৪] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol-1,* (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001) p. 1.

[৫] দেবযানী ঘোষ ও সায়ক মুখার্জি (সম্পাঃ), *দেশভাগঃ অকথিত ইতিহাস,* পৃ. ৭৩।

বাড়তে থাকলে সেনা শিবিরে স্থানসংকুলান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, ফলে সৈন্যদের পরিত্যক্ত তাঁবু দিয়ে সেনা ছাউনির বাইরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করা হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পুরনো অভিবাসীদের (১৯৫০-১৯৫১) জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: ১৯৪৯-এ শুধুমাত্র অসমর্থ্য, অথর্ব পুরুষ সদস্য, অভিভাবকহীন মহিলা ও শিশুদের জন্য গঠিত পিএল ক্যাম্প ছাড়া বাকি ত্রাণ শিবির বন্ধের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র সরকার। কিন্তু ১৯৫০-এর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধি পেলে, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সরকার বাধ্য হন। এই সময় আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করলে সেই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ত্রাণের কথা না ভেবে কেন্দ্র সরকার তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য মনে করে। এই পর্যায়ের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার তিনটি স্তর- ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সাধারণ ব্যবস্থা। প্রাথমিকভাবে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে গিয়ে ডোল এর ব্যবস্থা করা হত, পরবর্তীকালে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করা হত। ত্রাণ ও পূনর্বাসনের জন্য শরণার্থীদের যথাক্রমে বিভিন্ন ধরনের অনুদান ও ঋণ দেওয়া হত।[৬] কিছু 'সাধারণ ব্যবস্থা' (General measures) ছিল যা থেকে উভয়েই উপকৃত হত। চিকিৎসা এবং শিক্ষাকে সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়ের পুরনো অভিবাসীদের জন্য (১৯৫২-১৯৫৮) পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: উদ্বাস্তু আগমন কমতে থাকলে সরকারি তথ্য মাফিক ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে আবার সমস্ত ত্রাণ শিবিরগুলি বন্ধ করা হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি পাসপোর্ট ও ভিসা চালুর ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গের বুকে আবারও উদ্বাস্তু মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে। পুনরায় সজীব হয় ত্রাণশিবিরগুলি। তবে এই উদ্বাস্তু আগমনকে প্রতিহত করতে কেন্দ্র সরকার ১৯৫৬ সালে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট কিছু ইস্যু করা শুরু করছিল।[৭] পূর্বের মতো এই পর্যায়েও উদ্বাস্তুদের জন্য ১) ত্রাণ, ২) পুনর্বাসন, ৩) সাধারণ ব্যবস্থা এই তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবে এই সময় পুনর্বাসন স্কিমগুলির কিছু হেরফের হয়েছিল। এই সময় পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। এই পর্যায়ে 'সাধারণ ব্যবস্থা'র অন্তর্গত চিকিৎসা ক্ষেত্রে যক্ষারোগীদের কথা চিন্তা করে বিশেষ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জোর প্রদান করা হয়েছিল।

পুরনো অভিবাসীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার প্রথম দিকে ত্রাণ শিবিরগুলি কার্যকারিতার ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল, এগুলি হল রিলিফ ক্যাম্প, ট্রানজিট ক্যাম্প, ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প এবং কলোনি ক্যাম্প। পরবর্তীকালে সবগুলিই কার্যত ত্রাণ শিবিরে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫৭-এর মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট ক্যাম্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১২টি।[৮] প্রাথমিকভাবে ত্রাণ বন্টনের কেন্দ্র ছিল রিলিফ ক্যাম্প। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাদের পাঠানো হবে বলে নির্ধারণ করা হত তাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখা হত। যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম পুরুষ সদস্য থাকত তাদেরকে প্রথমেই পুনর্বাসন সাইটে পাঠানো হত এবং সেই পুরুষ সদস্যকে সাইটের উন্নতির কাজে লাগানো হত। সেখানে শ্রমের বিনিময়ে তারা উপার্জন করত। তার সঙ্গে

[৬] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, *Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal,* Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal, p. 12.
[৭] *Estimate Committee Reports (1959-60)*, p. 4.
[৮] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p .6.

পরিবারের বাড়তি সদস্যদের জন্য দেওয়া হত ডোল। এগুলিকে বলা হত কলোনি ক্যাম্প। কারণ, এগুলি পুরোপুরি কলোনিও নয় আবার পুরোপুরি ক্যাম্পও নয়।[৯]

ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প: উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারি প্রকল্পগুলিতে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হত। যেমন, বাগজোলা ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা সেচ-খাল খনন করা, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, মোর ল্যান্ড প্রজেক্ট ইত্যাদি। রাস্তা তৈরি, ক্যানেল তৈরি, বাঁধ তৈরি ছাড়াও চাষের কাজে খনন কার্যে ও সেচ দপ্তরেও তাদেরকে কাজে লাগানো হত। এগুলোর পাশাপাশি নবাগত উদ্বাস্তুদের তাঁবু তৈরি, ঝুড়ি তৈরি, ইঁট তৈরি ইত্যাদির কাজে লাগানো হত।[১০]

এই সমস্ত ক্যাম্পগুলির বাইরেও আরো দুটি পিএল ক্যাম্প ও মহিলা ক্যাম্প ছিল। পিএল ক্যাম্প রাখা হত বার্ধক্যে উপনীত বা ক্রনিক ব্যাধিতে আক্রান্ত, অ-কর্মক্ষম এবং পরিবারের দেখাশোনা করবার মতো কেউ নেই এমন পুরুষ এবং অভিভাবকহীন মহিলা ও অনাথ শিশুরা। এই দুই শ্রেণির জন্য বিভিন্ন হোমগুলি দীর্ঘকালের জন্য খোলা রাখা হয়েছিল।[১১] পিএল ক্যাম্পে মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে অসমর্থ্য, অথর্ব, শারীরিকভাবে অক্ষম বৃদ্ধ পুরুষরাও থাকতে পারতেন। কিন্তু মহিলা ক্যাম্পের ক্ষেত্রে কোন পুরুষ সদস্য থাকতে পারতেন না; সেখানে কেবলমাত্র মহিলা এবং শিশুরা থাকতেন। ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষর অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হত। ট্রানজিট ক্যাম্প, রিলিফ ক্যাম্প ও কলোনি ক্যাম্পগুলি ছিল প্রাথমিক ত্রান বন্টনের ক্ষেত্র।

পুরনো অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের ১) গ্রামকেন্দ্রিক এবং ২) শহরকেন্দ্রিক এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল। যেখানে তাদের জন্য হাজার হাজার একর চাষযোগ্য এবং বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধরনের ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল।[১২]

১) গ্রামাঞ্চলে পুনর্বাসন: গ্রামকেন্দ্রিক উদ্বাস্তুদের কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কৃষিজীবি পরিবারের জন্য চারটি প্রকল্প ছিল। ক) টাইপ প্রকল্প, খ) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প, গ) বারুজীবী প্রকল্প, ঘ) সবজি চাষ প্রকল্প। অ-কৃষিজীবী পরিবারের জন্য তিনটি প্রকল্প ছিল। ক) টাইপ প্রকল্প, খ) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প, গ) ইউনিয়ন বোর্ড পরিবর্ত প্রকল্প।

কৃষিজীবি পরিবারের জন্য প্রকল্পসমূহ:

ক) **টাইপ প্রকল্প:-** সাধারণ টাইপ স্কিম অনুযায়ী, উদ্বাস্তুদের সরকার অধিগৃহীত জমি বা জমি কেনার জন্য পরিমাণ ঋণ দেওয়া হত। ঋণ ও অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল পরিবার পিছু ১৯০০ টাকা। তার মধ্যে ছিল ৫৫৫ টাকা গৃহনির্মাণের জন্য, কৃষিঋণ বাবদ ৬০০ টাকা, জীবিকা নির্বাহের জন্য ছয় মাসের ঋণ এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেচ ও ভূমিসংস্কারের জন্য একর পিছু যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ টাকা ঋণ দেওয়া হত। এর মধ্যে ১ মাসের নগদ ডোলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিবার পিছু জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল সরকার অনুমোদিত স্কিমে ২ একর এবং ব্যক্তিগত বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পৌনে দুই একর।

খ) **ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প:-** ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্পে সরকার, ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের সক্রিয় সহায়তায় বিভিন্ন মৌজায় উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পুনর্বাসন দিতে

---

[৯] Dipak Kumar Sarkar, *Refugee and Migration Problems in West Bengal: Society, Economy and Polity (1947 2000),* Thesis Submitted in 2016 for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of North Bengal, p. 144.

[১০] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 2.

[১১] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp. 6-7.

[১২] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 8.

চেয়েছিল। এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছিল স্থানীয় মানুষ ও ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের সহযোগিতা ও সাহায্যের ওপর। উদ্বাস্তুরা তা পায়নি। এই প্রকল্প অনুযায়ী জমি কেনার জন্য উদ্বাস্তুদের কোনো ঋণ দেওয়া হত না। পুনর্বাসন-ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা নিজেদের টাকা দিয়ে কেনার মতো জমি খুঁজে পায়নি। এই প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

গ) **বারুজীবী প্রকল্প:-** বারুজীবী প্রকল্প অনুযায়ী, পানচাষের জন্য উদ্বাস্তুদের গড়ে ২ বিঘা পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছিল ৮ কাঠা করে। সেচের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় এই প্রকল্পও ব্যর্থ হয় ।

ঘ) **সবজি চাষ প্রকল্প:-** এই প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশই অকৃষিজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং তাদের সবজি চাষের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। জমিও সবজি চাষের উপযুক্ত ছিল না, সেচের ব্যবস্থাও ছিল না। কলকাতা থেকে দূরে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত বাজারও ছিল না বলে এই প্রকল্পের মতো ব্যর্থ হয়।

অ-কৃষিজীবী পরিবারের জন্য তিনটি প্রকল্প ছিল:

ক) **টাইপ প্রকল্প:-** গ্রামীন অ-কৃষিজীবী পরিবারগুলির জন্য এই স্কিমে সরকার থেকে বাস্তু জমির প্লট অথবা নিজেরাই জমি কিনতে চাইলে তার জন্য ঋণ দেওয়া হত। ঋণ বা অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সীমা ছিল পরিবার পিছু ১৭৭৫ টাকা। এর মধ্যে গৃহনির্মাণ ঋণ ৫০০ টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ ৫০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঋণ, এক মাসের নগদ ডোল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও যারা নিজেরা উদ্যোগে জমি কিনত তাদের প্লট পিছু ৭৫ টাকা করে দেওয়া হত।

খ) **ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প:-** এই প্রকল্পের স্কিমগুলি টাইপ প্রকল্পের কাছাকাছিই ছিল।

গ) **ইউনিয়ন বোর্ড পরিবর্ত প্রকল্প:-** এই প্রকল্পের স্কিমগুলিও টাইপ প্রকল্পের অনুরূপ। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অ-কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের এককালীন অ-ফেরতযোগ্য কিছু টাকা (সালামি) প্রদান করে বৃহৎ পতিত জমিগুলিতে তাদের বসতি স্থাপন করানো। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত দীর্ঘসুত্রিতা ও জটিলতা এড়াতে উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত জমিদারদের জমিতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এর বিপরীতে যেখানে জবরদখল কলোনিগুলির ক্ষেত্রে সরকারি অধিগৃহীত জমিগুলিতে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করত।[১৩]

2) শহরাঞ্চলে পুনর্বাসনঃ শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসন করার জন্য একাধিক ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। যেমন- বাস্তু জমি ক্রয়ের জন্য ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ, ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ, পেশার ক্ষেত্রে ঋণ ইত্যাদি।

পেশাগত ক্ষেত্রে ঋন: গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিভিন্ন পেশাজীবী উদ্বাস্তু যেমন ডাক্তার, আইনজীবী, কবিরাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বইপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা: পুরনো অভিবাসীদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সাধারণ হাসপাতাল, যক্ষা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঔষধালয়ের সংখ্যা ও হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। নতুন যক্ষা হাসপাতাল, জেনারেল বেড, আউটডোর বিভাগ, যক্ষার চেস্ট ক্লিনিক খোলা হয়েছিল। ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্যাম্পবাসী ও ক্যাম্প বহির্ভূত যক্ষা আক্রান্ত উদ্বাস্তু ও তার পরিবারের জন্য বরাদ্দগুলি ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা: উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠনের জন্য রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। যেমন- প্রত্যেকটি ক্যাম্পে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হয়। তার জন্য সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণ

[১৩] Ibid, pp. 8-9; প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ২৮-৩০।

সরকারের তরফ থেকে অনুদান ও ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়। আগে থেকেই বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্বাস্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত আসন সংযোজন, সংরক্ষণের ব্যবস্থা, হোস্টেলে আসনসংখ্যা বাড়ানো, দুঃস্থ উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ইত্যাদি বাবদ বিভিন্ন রকম আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি, অনুদান, ঋণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বহু উদ্বাস্তু শিক্ষকদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৬ সালের রিপোর্ট অনুসারে, ৭০০০ শিক্ষকের মধ্যে ৯৫% ছিলেন পূর্ব থেকে আগত উদ্বাস্তু, যারা সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৪]

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ: বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বহু উদ্বাস্তু যুবক-যুবতী লাভজনক কর্মসংস্থানের সন্ধান পান। রাজ্য সরকার পুরুষদের জন্য টিটাগর, হাবরা ও গয়েশপুর এবং মহিলাদের জন্য উত্তরপাড়া, হাবড়ার নারী সেবা সংঘ, উদয় ভিলায় তিনটি আবাসিক ও কিছু অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালনা করত, যেখানে দুই হাজারেরও বেশি ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। এছাড়াও টিটাগর, হাবড়া, গয়েশপুর, তাহেরপুর, চাকদা, রূপশ্রী পল্লী, শান্তিপুর বয়ন প্রতিষ্ঠান মিলে পুরুষদের জন্য সাতটি এবং হাবড়া, মিয়ারবার, উদয় ভিলা, টিটাগর ক্যাম্প নম্বর ২ এ মহিলাদের জন্য চারটি মোট ১১টি উৎপাদন কেন্দ্রে প্রায় ১৫০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছিল। ১৯৫৬ পর্যন্ত বয়ন, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি এবং কারিগরি বিদ্যা মিলে ৫০০০ মহিলাসহ প্রায় ২৫,৩৭১ জন যুবক যুবতী প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যবসা শুরু করেছিলেন সেখান থেকে পরে আবার আরো কিছু উদ্বাস্তু যুবক-যুবতী তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছিলেন।[১৫]

এর পাশাপাশি প্রচুর ছেলে-মেয়ে অ্যাপ্রেন্টিসসিপ স্কিমে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। ১৯৬০ পর্যন্ত ১৭,০০০ মহিলাসহ ৪৫ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তু ক্র্যাফটসম্যান, সুপারভাইজার ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রশিক্ষণ এছাড়াও হোমে বসবাসকারী পরিবারহীন মহিলাদের প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানের জন্য জন্য ৩৮টি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাপানি প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় গড়ে ওঠা কামারহাটি বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। সেখানে ৯০ জন কর্মরত উদ্বাস্তু ছিলেন ৩০০ পরিবারের উপার্জনের মাধ্যম।[১৬]

শিল্প সংক্রান্ত স্কিম:

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: পুরনো অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঘনবসতিপূর্ণ উদ্বাস্তু কলোনিগুলির আশেপাশে ছোট থেকে মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার জন্য ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্বাসন মন্ত্রক শিল্প সংক্রান্ত কিছু স্কিম নিয়ে আসেন। এই স্কিম অনুসারে, বিভিন্ন শিল্পপতিদের আংশিক বা পূর্ণ সরকারি সহায়তায় মাঝারি ধরনের শিল্প গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা হত। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন মন্ত্রকের সাহায্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলি তখন চালু হয়েছিল।[১৭]

মাঝারি শিল্পঃ ১৯৫৯-এর ১-লা জানুয়ারি পর্যন্ত ১৮টি মাঝারি শিল্প স্কিমের অনুমোদন দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে। সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে রয়েছে আটটি স্পিনিং মিল, একটি হোসিয়ারি কারখানা, তিনটি প্রকৌশল শিল্প, চারটি হিউম পাইপ কারখানা, একটি চিনিকল, একটি রাসায়নিক কারখানা এবং একটি সেরামিক কারখানা।[১৮] উদ্বাস্তুদের উপার্জনের জন্য ১৯৫৪ সালে রিফিউজি হ্যান্ডিক্রাফট সেলস এম্পোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখান

[১৪] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, pp. 8-9.
[১৫] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, pp. 6 & 21.
[১৬] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp. 12-13.
[১৭] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, pp. 6 & 24.
[১৮] *Estimate Committee Reports (1959-60),* pp. 30-32.

থেকে ১৯৫৬ সালের ৩১-শে মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ দু বছরের মধ্যেই ৩৫ লক্ষ টাকার জিনিস বিক্রি হয় এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকা লাভ হয়।[১৯] উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে যেতে না চাইলে বা অন্যান্য পুনর্বাসন স্কিম নিতে অস্বীকার করলে তাদের দু-মাস অন্তর নোটিশ দিয়ে সতর্ক করে মোট চার মাস ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া হত। তারপরে ছয় মাসের নগদ ডোল অগ্রিম দিয়ে তাদের ক্যাম্প ছেড়ে দিতে বলা হত।[২০]

সরকারি অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি: উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, সরকার অধিগৃহীত জমির ওপর কলোনি গড়ে তুলেছিল যেগুলি সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে; উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার ৮৫,০০০ একর জমির ওপর ৫২৮টি কলোনি স্থাপন করেছিলেন; যার মধ্যে ২৮৮টি ছিল শহরে এবং ২৪০টি ছিল গ্রামীণ এলাকায়। এর মধ্যে ১৪৫টি পুরোপুরি কৃষি কলোনি। এই সমস্ত কলোনিগুলিতে ৯০,০০০ পরিবারকে বাস্তু জমি ও ২৩,০০০ পরিবারকে কৃষি জমি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য গ্রামীন এলাকায় থাকা কিছু কিছু কলোনি অ-কৃষি হওয়ায় পৌর কলোনি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।[২১]

১৯৫৮ সালের ৩০ শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে আগত ৩১.৩২ লক্ষ পুরনো অভিবাসনকারী উদ্বাস্তুর মধ্যে ৭.৯২ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[২২] অর্থাৎ মোট উদ্বাস্তু সংখ্যার ২৫ শতাংশ সরকারি ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাকি ৭৫ শতাংশ সরকারি ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে আশ্রয়গ্রহণ করেননি এবং এদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারকে ভাবতে হয়নি। এই ৭৫ শতাংশ উদ্বাস্তু তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আগে ভারতে চলে আসা কোনো পারিবারিক সদস্যের সাহায্যে নিজেদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান খুঁজে নিয়েছিলেন।[২৩] আবার অনেকে ত্রাণ শিবিরগুলির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য মনুষ্যেতর জীবন যাপনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শিবির ত্যাগ করেছিলেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী তার 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে এই ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের জীবন যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন। শিবিরের এক একটি ঘরে কুড়িটি উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তারা ইঁট, পাথরের টুকরো বা ছেঁড়া বস্ত্রখন্ড প্রভৃতি দিয়ে নিজেদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ স্থানটুকু অন্য পরিবার থেকে পৃথক করে রাখত।[২৪] এস্টিমেট কমিটি রিপোর্টেও ক্যাম্পগুলির অবস্থা অসন্তোষজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। দাসপাড়া, রিলায়েন্স ক্যাম্পে কমিটির পরিদর্শক দল পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন একটি সংকীর্ণ গুদাম ঘরে কোনো পর্দা বা দেওয়াল ছাড়াই গাদাগাদি করে অনেকগুলি পরিবার একসঙ্গে বসবাস করছে। ক্যাম্পবাসীদের মধ্যে ১৫ জন যক্ষা আক্রান্ত। নটি নলকূপের মধ্যে পাঁচটিই অকেজো।[২৫]

বর্তমান গবেষণায় অনেক সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ক্যাম্পে দেওয়া বা ডোল থেকে পাওয়া চালের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাদের অনেকের মতে সেই চাল দিয়ে তারা রান্না করেও ভাত খেতে পারতেন না। অনেক সময় তাদের না খেয়েই থাকতে হত।[26] অন্যান্য খাবার খাদ্য সামগ্রী নিয়েও

---

[১৯] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p.6.

[২০] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p.16.

[২১] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp.10.

[২২] Ibid, p. 1.

[২৩] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 6.

[২৪] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২৬।

[২৫] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p.7.

[২৬] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, বয়স-৮১, পেশা-অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বই লেখক ও যাত্রাশিল্পী, মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

তাদের অভিযোগ ছিল। তবে সরকারি ক্যাম্পগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের বেরিয়ে আসার ফলশ্রুতিতে সেই সময় জন্ম নিয়েছিল জবরদখল কলোনি ও প্রাইভেট কলোনিগুলি।

জবরদখল কলোনি: পশ্চিমবঙ্গে জবরদখল কলোনির গোড়াপত্তন শুরু হয় ১৯৫০ এর আগেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের হাত ধরে। তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের খালি, পরিত্যক্ত জমিগুলি অনুমোদনহীন ভাবে দখল করেন ও থাকতে শুরু করেন। এইভাবে প্রথমে কলকাতা ও শহরতলীর আশেপাশে জন্ম নিয়েছিল জবর দখল কলোনিগুলি।[27] পুরনো অভিবাসীদের প্রথম পর্যায়ের পুনর্বাসনে কলকাতা, ও কলকাতা-সংলগ্ন অঞ্চলের নিচু পরিত্যক্ত জলাজমিতে, ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে এই ধরনের কলোনি গড়ে ওঠার কথা জানতে পারা যায়। পরবর্তীকালে যা ছড়িয়ে পড়ে যাদবপুরের সেনা ছাউনির সরকারি পরিত্যক্ত জমি, দমদম, বরানগর, নৈহাটির পরিত্যক্ত সরকারি জমি দখলের মাধ্যমে। ১৯৫০- এর আগে গঠিত এরূপ ১৪৯টি কলোনির হদিস পাওয়া যায় যা ১৪৯ গ্রুপ জবরদখল কলোনি নামে পরিচিত। সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত জবরদখল কলোনিগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয় ও নিয়মিত-করনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কলোনিগুলিতে যাতে উদ্বাস্তুরা সমস্ত রকম নাগরিক পরিষেবা পান সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।[28] পরবর্তী পর্যায়ের উদ্বাস্তু আগমনে এই জবরদখল কলোনিগুলি বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল ও সরকারি পুনর্বাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু আগমন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে বিশেষ করে বহু জেলার গ্রামীণ এলাকায় কৃষি বা অকৃষি ফাঁকা জমিগুলোতে এই কলোনিগুলি দেখা গিয়েছিল। যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায়। এইসব কলোনিগুলিতে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণির উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তারা সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই ধরনের জবরদখল কলোনিগুলি ছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে। জবরদখল কলোনিগুলি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক) ১৪৯ গ্রুপ জবরদখল কলোনি, খ) ১৭৫ গ্রুপ জবরদখল কলোনি, গ) ৬০৭ গ্রুপ জবরদখল কলোনি, ও ঘ) সরকার অনুমোদিত জবরদখল কলোনি।

সরকারি, আধা-সরকারি ও প্রাইভেট জমিগুলিতে উদ্বাস্তুরা যে সমস্ত জবরদখল কলোনিগুলি গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে ১৯৫২ সালে গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি ১৪৯টি এই ধরনের কলোনি খুঁজে পায়, যেগুলি দেশভাগের পর পরই গড়ে উঠেছিল, এর জন্য তখন এই কলোনিগুলির নাম দেওয়া হয় ১৪৯ গ্রুপ কলোনি। আবার ১৯৭৫-এ একই ভাবে ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের রিসিডিউল প্রবলেম অনুসন্ধানকারী একটি কার্যকরী দল ১৭৫টি এই ধরনের কলোনী খুঁজে পান যেগুলি গড়ে উঠেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই কলোনি গুলির নাম হয় ১৭৫ গ্রুপ। একই রকম ভাবে ১৯৫১ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ এর ২৫-শে মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত কলোনিগুলিকে পাওয়া যায় যাদেরকে ভারত সরকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা সাপেক্ষে টপ প্রায়োরিটি দিয়েছিলেন সেগুলি ৬০৭ গ্রুপ নামে নথিভুক্ত করা হয়।[29]

---

[২৭] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp. 10-11.

[২৮] Ibid, p. 11; *Estimate Committee Reports (1959-60),* p. 30; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 4.

[২৯] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* p .17.

প্রাইভেট কলোনি: জবরদখল কলোনিগুলির পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি বা ব্যক্তিগত বিভিন্ন ফাঁকা জমিতে, নিচু জলা জায়গায়, সরকারি সহায়তায় বা সরকারি সাহায্য ছাড়াই পশ্চি মবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুরা মাথা গোঁজার জন্য প্রায় ৭৫০টি প্রাইভেট কলোনি গড়ে তুলেছিলেন।[৩০] কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আইনের মাধ্যমে সরকারের দ্বারা জমি গ্রহণ করে 'প্রাইভেট কলোনি' নাম দিয়ে উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলাগুলিতে এই প্রাইভেট কলোনিগুলির অস্তিত্ব ছিল।

উদ্বাস্তু কলোনিগুলির জন্য পুনর্বাসন স্কিম: পূর্বে আলোচিত, সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি, জবর দখল কলোনি ও প্রাইভেট কলোনি যেগুলি ছিল সেগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার ও নিয়মিত-করন করার কথা ভাবা হয়। রাজ্য সরকার সরকার অনুমোদিত কলোনিগুলির উন্নয়নের জন্য একটি স্কিম পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুসারে সরকার অনুমোদিত অ-কৃষি গ্রামীন ও পৌর কলোনিগুলিতে রাস্তা-ঘাট, জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি খতিয়ে দেখার জন্য একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে কেন্দ্র সরকার অন্যান্য কিছু সংখ্যক কলোনির ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা প্রয়োগ করে। কেন্দ্র সরকার এই কাজের জন্য একটি ফান্ড ঋণ হিসেবে দান করে। প্রথমে কিছু সরকার অনুমোদিত কলোনি ও ১৯৫০-পূর্ববর্তী জবর দখল কলোনিগুলিকে উন্নয়নের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এই সমস্ত কলোনিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার চুক্তি বিভাগের সূচনা করে যার দ্বারা দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা হয়।[৩১]

১৯৭৫-এ কেন্দ্র সরকার একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে যার কাজ ছিল এসমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করা এবং তৎকালীন অবশিষ্ট সমস্যা খতিয়ে দেখা। ১৯৭৫-৭৬-এ CMDA-এর বাইরে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত কলোনিগুলির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ ছিল, প্লট পিছু যথাক্রমে ৪,৫৬০ টাকা ও ৩,৬০০ টাকা।[৩২] কলোনিগুলিকে উন্নয়নের কাজের ভিত্তিতে ১) উন্নতির কাজ শেষ হয়েছে ২) অনুন্নত এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মধ্যবর্তীকালীন উদ্বাস্তুদের (১৯৫৮-১৯৬৩) পুনর্বাসন:

এই সময় আসা উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার কোনো রকম পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেনি। সরকারের ধারণা ছিল পুনর্বাসন না দিয়ে তাদের পূর্ববঙ্গ থেকে এই দেশে আসতে নিরুৎসাহিত করলে হয়ত উদ্বাস্তু আগমন থেমে যাবে। ১৯৫৯ জুলাই মাস নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ত্রাণ শিবিরগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। কারণ, উদ্বাস্তু আগমন থেমে থাকেনি।[৩৩]

নিউ মাইগ্রেন্টসদের (১৯৬৪-১৯৭১) পুনর্বাসন:

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'হযরত মহম্মদ (সা.)- এর চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই বঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা ভারতে আসতে থাকে। ফলে সরকার আবারও উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দেবার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। নতুন অধিবাসীদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর কিছু ইন্টার সেপশন বা রিসেপশন সেন্টার খোলা হয়েছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত এলাকাতেই অভিবাসীদের নথিভুক্ত করা,

[৩০] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 11.
[৩১] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p. 30; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 5.
[৩২] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* pp. 27.
[৩৩] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp.5-6.

সাময়িক ত্রাণ প্রদান করা, নথিপত্র যাচাই করা, টিকাকরণ প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের মুহূর্তে শরণার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে তাদের ইন্টারসেপশন স্লিপ দেওয়া হত, যার দ্বারা সে ও তার পরিবারবর্গ উদ্বাস্তু হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেত। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। পশ্চিমবঙ্গে এরকম রিসেপশন সেন্টারগুলি হল- বানপুর, পেট্রোপোল, হোসনাবাদ ও শিয়ালদা। ইন্টারসেপশন সেন্টারগুলি হল- বসিরহাট, বালুরঘাট, মালদা, কোচবিহার, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ক্যানিং, বহরমপুর।[৩৪]

স্লিপ পাওয়ার পর শরণার্থীদের ট্রানজিট সেন্টারে পাঠানো হত। উদ্বাস্তু মানুষের চাপে সেইসময় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা আগে থেকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, জায়গার অভাব ও পুনর্বাসনযোগ্য জমির অভাব ইত্যাদির মধ্যে নতুন করে উদ্বাস্তু মানুষের ঢেউ সামাল দেওয়া রাজ্যের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যে এই উদ্বাস্তু মানুষের চাপ কমানোর জন্য সেই সময় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দেওয়ার। এই উদ্দেশ্যেই মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের কাছে মানা এলাকায় ট্রানজিট সেন্টারগুলো খোলা হয়েছিল। এছাড়াও কুরুদ, নওগাঁ, ভান পুরি, শবরী ও ডিবিকে রেলওয়ে ইত্যাদিতেও ট্রানজিট সেন্টার খোলা হয়েছিল। পাকাপাকিভাবে পুনর্বাসন পাওয়ার আগে পর্যন্ত সাময়িক থাকার ব্যবস্থা, এইসব ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে ছিল। এখানে থাকাকালীন শরণার্থীদের ত্রাণ সরবরাহ করা হত।[৩৫]

এ সমস্তই ছিল সরকারি হিসাব, কিন্তু বাস্তবে যারা এই সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করেছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর ছিল না। এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যার ঘাটতি ছিল। এছাড়াও চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। যেমন- হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য ঠিকঠাক খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল না, যার কারণে ভর্তির পর রোগীরা বেশিরভাগ সময় অপুষ্টি জনিত রোগে ভুগতেন।[৩৬]

ট্রানজিট সেন্টার থেকে শরণার্থীদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের ত্রাণ শিবিরগুলি। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য কিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলায় ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাটের রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান যেন তারা শরণার্থীদের তাদের রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। যার কারণে, ঐ সমস্ত রাজ্যে রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। স্থায়ী পুনর্বাসন পাওয়ার আগে পর্যন্ত এই সমস্ত রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে মানা, কুরুদ, নওগাঁ, ভান পুরি, শবরী ও ডিবিকে রেলওয়ে ইত্যাদির ট্রানজিট সেন্টারগুলি থেকে আসা শরণার্থীরা সাময়িকভাবে অবস্থান করতেন। এখানেও তারা ট্রানজিট সেন্টারের অনুরূপ ত্রাণ পরিষেবাগুলি পেতেন। এরপর শরণার্থীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত ক্যাম্পগুলি থেকে তাদের দণ্ডকারণ্য প্রকল্প অনুসারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে যেমন পুনর্বাসনযোগ্য জমি ছিল সেখানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিহার এন.ই.এফ.-এ তে ৩৪টি কৃষি স্কিম এবং আসাম, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এই চারটি রাজ্যের ১৬টি অ-কৃষি বা শিল্প স্কিম মিলিয়ে মোট ৫০টি স্কিমের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৫ পর্যন্ত অর্থাৎ নতুন অধিবাসীদের আগমনের এক বর্ষকালের

---

[৩৪] *Estimate Committee Reports (1964-65),* 3rd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi, p. 12.

[৩৫] Ibid, p. 18.

[৩৬] *Estimate Committee Reports (1964-65)*, pp. 22-23 & 26.

মধ্যে এই সমস্ত স্কিমের আওতায় মোট ২৩,২৯৬ উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছিলেন; যার মধ্যে ২২,০৪০টি পরিবার কৃষিজীবী ও ১২৫৬টি পরিবার ও অ-কৃষিজীবী। সেখানে তাদেরকে বিভিন্ন ঋণ ও অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হত।[৩৭]

পুরনো অভিবাসীদের মতো নতুন অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও ক্যাম্পে না থাকার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৬৪ সালের এস্টিমেট কমিটি রিপোর্ট অনুসারে ৩৩.০৮ শতাংশ শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন বাকি ৬৬.৯২ শতাংশ শরণার্থী ক্যাম্পের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায় নিজেদের প্রচেষ্টায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এক্ষেত্রেও যারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিজনের সাহায্যে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন।[৩৮]

উপসংহার:

দেশত্যাগ করে ভারতে চলে এসেই উদ্বাস্তুদের দুর্দিন শেষ হয়ে যায়নি, তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আশ্রয় বা পুনর্বাসনের জন্য। ভারতের দুই প্রদেশের উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র সরকার মনোভাব, এবং সর্বোপরি বাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের মনোভাবে তাদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রকাশ পায়নি। উদ্বাস্তুরা কোন পরিস্থিতিতে নিজেদের দেশ, আজন্ম পরিচিত পরিবেশ, পূর্ব-পুরুষের ভিটেমাটি ও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এই দেশে বন্যার ঢেউ-এর মতো চলে আসছে তা একবার বিবেচনার প্রয়োজন মনে করেনি সরকার। উদ্বাস্তু সমস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম নয় আগেও ইউরোপীয় দেশগুলিতে ঘটতে দেখা গেছে। Liisa H. Malkki রিফিউজি শিবিরগুলিকে অন্যভাবে দেখার কথা বলেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে রিফিউজি শিবিরগুলিকে শুধুমাত্র 'Place of Refuge' হিসেবে দেখলে হবে না, সেগুলিকে অন্যদের দেখা উচিত 'Devise of Power' হিসেবে। Malkki তার যুক্তির স্বপক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ Post-war ইউরোপের প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপের দেশগুলিতে উদ্বাস্তুদের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তুদের বিষয়টি শুধুমাত্র মানবিকতার নজরেই দেখে নি বরং তাদেরকে দেখা হয়েছিল সামরিক সমস্যা রূপেও। তিনি আরও বলেছেন, উদ্বাস্তু শিবিরগুলিকে পরিদর্শনযোগ্য করে, প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক দক্ষতায় শিবিরের বন্দীদের শ্রেণিকরণ, পৃথকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩৯] সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরে থাক, পশ্চিমবঙ্গে নিত্যদিন জমতে থাকা উদ্বাস্তুদের জটলা সরিয়ে ফেলতে সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। স্বাধীন 'শিশু-রাষ্ট্র' ভারত, দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে সর্বহারা, ভিঠে-ছাড়া বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা, নির্ভরতার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি।

---

[৩৭] Ibid, pp. 33-34 & 56.

[৩৮] Ibid, p. 5.

[৩৯] Liisa H. Malkki, Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National Order of Things, *Annual Review of Anthropology*, Vol-24, 1995.

Reference:

1. Chakrabarty, Saroj. With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers. A Record up to 1962, (Calcutta: Benson's, 1974).
2. Prakashi, Kranti B. The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal, (Calcutta: Editions India, 1971).
3. রায়, রনজিৎ। ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন। (কলকাতা: শঙ্খ প্রকাশন, ১৯৭৭)।
4. দেবযানী ঘোষ ও সায়ক মুখার্জি (সম্পাঃ)। দেশভাগ: অকথিত ইতিহাস। (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২৩)।
5. পল্লী বান্ধব প্রত্রিকা। ১৩-ই আগস্ট ১৯৪৮, আজাদ প্রত্রিকা। ৩১-ই আগস্ট ১৯৪৯।
6. File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal.
7. Estimate Committee Reports (1959-60), 2nd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, New Delhi.
8. Estimate Committee Reports (1964-65), 3rd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi.
9. Home Political CR, B Dec. 1950, 602-622, West Bengal State Archive, Kolkata.
10. Home Political CR, B May 1950, 249-272, West Bengal State Archive, Kolkata.
11. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়। উদ্বাস্তু। (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩)।
12. File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal, Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Govt. of India, March 1976.
13. Sarkar, Dipak Kumar. Refugee and Migration Problems in West Bengal. Society, Economy and Polity (1947 2000). Thesis Submitted in 2016 for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of North Bengal.
14. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার। প্রান্তিক মানব। (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩)।
15. সাক্ষাৎকার:- রাধাশ্যাম নন্দী, বয়স-৮১, পেশা-অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বই লেখক ও যাত্রাশিল্পী, মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।
16. Manual of Refugee Relief and Rehabilitation. vol-1, (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001)
17. Malkki, Liisa H. Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National Order of Things. Annual Review of Anthropology. Vol-24, 1995.